জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৩, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে চট্টগ্রাম শহর: নাগরিক সমাজের ভূমিকা

তাসলিমা ইসলাম*

Abstract

During World War II the famine of 1943 is struck in the Bengal province of British India. About three million people died due to malnutrition and disease. In this famine, Chittagong is the most effected city of east Bengal. The government failure to allocate sufficient rice or relief in this city. There is also rampant corruption and nepotism the distribution of government aid. On the other hand, half of the goods disappeared into the black market or into the hands of friend or relatives. As a result, In May and June famine became terrible in Chittagong. Deaths from starvation throughout this city and number of living skeleton increasing. In this situation communists, socialists, wealthy merchants, women`s group and also at the individual level played an important role. This civil society served relief efforts, donations of money, food, treatment etc.

চাবিশব্দ: দুর্ভিক্ষ, চট্টগ্রাম শহর, সিভিল সোসাইটি, কম্যুনিস্ট পার্টি

বাংলায় দুর্ভিক্ষ আঘাত হেনেছে বারবার। ১৭৭০ সাল থেকে অদ্যাবধি যেসকল দুর্ভিক্ষ বাংলায় আঘাত হানে তন্মধ্যে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ছিল ভয়াবহতম। বাংলা ১৩৫০ সালে এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বলে এটি 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামেও পরিচিত। ১৯৪১ সালের গণনা অনুযায়ী, ২১ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৬৩ শতাংশ মানুষ অর্ধাহারে এই মহামারীর সাথে লড়াই করেছে। সরকারি সূত্র অনুসারে, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু হয় আর বেসরকারি তথ্য মতে, এই সংখ্যা প্রায় ৩৫-৩৮ লক্ষ।[১] বাংলায় আঘাত হানা ভয়াবহতম এই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হয় চট্টগ্রাম শহরও। এই দুর্ভিক্ষে চট্টগ্রাম ছিল পূর্ববাংলার সবচেয়ে পীড়িত এলাকা। ভয়ংকর এই দুর্ভিক্ষ চট্টগ্রামবাসীর কাছে 'তেতাল্লিশের রাড' নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ব্যতীত অন্য কোনো দুর্ভিক্ষ চট্টগ্রামকে তেমন আক্রান্ত করতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে জাপানের নিকট বার্মার পতন হলে সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ শরণার্থী চট্টগ্রাম শহরে এসে ভিড় জমায়। এছাড়া দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামাঞ্চলের মানুষও দলে দলে শহরটিতে আসে খাদ্যের সন্ধানে। ফলে শহরটির জনসংখ্যা হঠাৎ করেই বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে ১৯৪২ সালের শুরু থেকেই খাদ্যশস্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরই সাথে মুনাফা শিকারী, কালোবাজারী ও মজুতদারদের সীমাহীন লোভ, খাদ্যশস্যের চরম দুষ্প্রাপ্যতা প্রভৃতি শহরটিকে দুর্ভিক্ষের চরম অবস্থায় পতিত করে। ১৯৪৩ সালের মে মাস থেকেই চট্টগ্রাম শহরের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। এ মহামারীর জটিলাবস্থা মোকাবেলায় শহরটির নাগরিক সমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে চট্টগ্রাম শহরের অবস্থা এবং দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় শহরটির নাগরিক সমাজের ভূমিকা আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

গবেষণার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

১৯৪৩ সালের বাংলার এই দুর্ভিক্ষ নিয়ে সামগ্রিকভাবে অনেক গবেষণা হয়েছে। এছাড়া এই দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত বেশকিছু শহর নিয়েও বিভিন্ন গবেষণা পাওয়া যায়। তবে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে পূর্ববাংলার সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত চট্টগ্রাম শহরটি নিয়ে একক কোনো গবেষণা হয়েছে বলে জানা নেই। তাই প্রবন্ধটিতে দুর্ভিক্ষকালীন চট্টগ্রাম শহরের অবস্থা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে উদ্ভূত দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় শহরটির নাগরিক সমাজের ভূমিকা তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে যা আঞ্চলিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। প্রবন্ধটি রচনায় ইতিহাস গবেষণার বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে প্রাথমিক সূত্র হিসেবে Sir John Woohead এর *`Famine Inquiry Commission: Report on Bengal',*[২] *The Statesman, Peoples War, বসুমতী* প্রভৃতি পত্রিকা ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম শহরের দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষদর্শী প্রথিতযশা লেখক, সাহিত্যিক ও ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী, লোকসাহিত্য প্রভৃতি প্রবাহমান সমাজ ও ইতিহাসের অন্যতম দলিলগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে দুর্ভিক্ষের উপর লিখিত বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহও প্রবন্ধটিতে প্রয়োজনানুসারে ব্যবহৃত হয়েছে।

দুর্ভিক্ষপূর্ব চট্টগ্রাম শহর

প্রাচীনকালের বিখ্যাত চট্টগ্রাম বন্দর উনিশ শতকের শেষার্ধে তার জৌলুস হারায়। কলকাতা বন্দরের উত্থানে চট্টগ্রাম বন্দর এ সময় থেকেই অনেকটা ম্লান হতে থাকে। যার প্রভাব পড়ে শহর বিকাশে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব চট্টগ্রাম ছিল পূর্ববাংলার একটি ছোট বন্দর শহর। তবে এই বন্দর শহরটির অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চা, বস্ত্র, জাহাজ নির্মাণ-শিল্প প্রভৃতি। ১৯৪১ সালের শুমারি অনুযায়ী চট্টগ্রাম শহরের আয়তন ছিল ৪.৫৬ বর্গ কিলোমিটার আর লোকসংখ্যা ৯২,৩০১।[৩] এ সময় শহরটিতে সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, ব্যবসায়ী, রেল শ্রমিক, মিস্ত্রি, কারিগর প্রভৃতি পেশার মানুষের বাস ছিল। তৎকালীন চট্টগ্রাম শহরটিতে ধন্যাঢ্য ব্যাক্তির সংখ্যা খুব কম ছিল।[৪] সে সময় শহরটির জীবনযাত্রার মান ছিল কম। অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক মুহাম্মদ নূরুল করিম এর *স্মৃতিকথা* থেকে জানা যায়, শহরটিতে এ সময় দ্রব্যমূল্য অনেক সস্তা ছিল। বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব সময়ে শহরটিতে অনায়েসেই এক টাকায় সাত সের খাঁটি দুধ, পাঁচ টাকায় এক মণ ভাল মানের চাল পাওয়া যেতো। এছাড়া একটি ভাল দোতলা বাড়ি মাত্র ২৫ টাকাতেই ভাড়া পাওয়া যেতো।[৫]

দুর্ভিক্ষে চট্টগ্রাম শহর

১৯৪৩ সালের বাংলার তথা চট্টগ্রামের দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন। এই বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার বাংলার সীমান্ত জেলা চট্টগ্রামকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করে। চলমান যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার চট্টগ্রামের পতেঙ্গা, হাটহাজারী, ডুলাহাজরা, চিড়িংগায় সামরিক বিমান বন্দর স্থাপন ও সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেয়। পরিকল্পনানুযায়ী কৃষকের ফসলি জমি নিয়ে নতুন নতুন রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়। এর ফলে এখানকার কৃষি জমি কমতে থাকে। বেকার হয়ে পড়ে ঐসকল এলাকার কৃষক শ্রেণি। অন্যদিকে ১৯৪২ সালের ১০ মার্চ জাপান বার্মা দখল করলে দেশটির সাথে চট্টগ্রামের সকল নৌ যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়। আরাকান-

চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ-চট্টগ্রাম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রুটে পরিবহন ও মালামাল বহনকারী সকল নৌ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া কর্নফুলি, শঙ্খ ও হালদা নদীর বিভিন্ন উপনদীগুলোতে চলমান হাজার হাজার নৌ চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে একদিকে নৌ পেশার সাথে জড়িত অসংখ্য কর্মজীবী বেকার হয়ে পড়ে। অন্যদিকে নৌ চলাচল বন্ধের ফলে বার্মা থেকে চাল আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। চট্টগ্রাম শহরে চালের সরবরাহ কমে যায়। চাকতাই, খাতুনগঞ্জ এর মতো বড় পাইকারী চালের আড়তগুলো খালি হয়ে যায়। চরম অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে চালের বাজার। লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে চালের মূল্য। এ সময় চাল ছাড়াও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী, বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যাদি ছিল অপ্রতুল। ফলে প্রায় সকল পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় অস্বাভাবিক হারে। অথচ দ্রব্যমূল্যের এই উর্ধ্বগতির সময় শহরটিতে বাসরত সরকারি চাকরিজীবী বা শ্রমিক শ্রেণি কারোরই বেতন বৃদ্ধি পায়নি। পণ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতায় বিপাকে পড়ে ব্যবসায়ী শ্রেণিও। ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শহরবাসী এক গভীর সংকটে নিপতিত হয়।

অন্যদিকে, জাপানের কাছে বার্মার পতনের পর সেখানে বাসরত চট্টগ্রামবাসী ফিরে আসে নিজ শহরে। এহেন যুদ্ধাবস্থায় বার্মার অনেক অধিবাসীও শরণার্থী হিসেবে চট্টগ্রাম শহরে আশ্রয় নেয়।[৬] খাদ্যের অপ্রতুলতায় গ্রামের নিরন্ন মানুষ দলে দলে শহরে ভিড় জমায়। চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক কর্মী, কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরীর বর্ণনায় এর যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭] যুদ্ধ পরিস্থিতিতে শহরটির নাসিরাবাদে সামরিক ক্যাম্প স্থাপন করে 'পাইওনিয়ার কোর' এর বিপুল সৈন্যের সমাবেশ ঘটানো হয়। ফলে হঠাৎ করেই শহরটিতে জনসংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যায়। স্বাভাবিভাবেই হঠাৎ করে বৃদ্ধি পাওয়া বিপুল এই জনসংখ্যা শহরের খাদ্যের উপর ব্যাপক চাপ বাড়ায়।

চালের অপ্রতুলতা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্ব গতি, শহরে নিত্য বৃদ্ধি পাওয়া মানুষ প্রভৃতি জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকার ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার মণ চাল রিলিফের জন্য বরাদ্দ দেয়।[৮] কিন্তু বরাদ্দকৃত এই রিলিফ বিপুল পরিমাণ মানুষের জন্য খুবই কম ছিল। চালের অপ্রতুলতায় ১৯৪২ সালের শুরু থেকেই চট্টগ্রামে চালের মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে ১৯৪৩ সালের শুরু থেকে মূল্যের এই উর্ধ্বগতি বাংলার অন্যান্য শহরকে ছাড়িয়ে যায়। নিচের সারণিতে তা স্পষ্ট[৯]:

১৯৪৩ সাল	খুলনা	বর্ধমান	ফরিদপুর	চট্টগ্রাম
জানুয়ারি	১০ টাকা ৬ আনা	১১ টাকা ১২ আনা	১৩ টাকা ৪ আনা	১২ টাকা ৪ আনা
ফেব্রুয়ারি	১২ টাকা ৮ আনা	১৩ টাকা ৮ আনা	১৩ টাকা ৮ আনা	১৩ টাকা ২ আনা
মার্চ	১৮ টাকা ১২ আনা	২০ টাকা ৫ আনা	১৮ টাকা	২৫ টাকা
এপ্রিল	২২ টাকা ৮ আনা	২৩ টাকা ৮ আনা	২০ টাকা	২৪ টাকা
মে	৩০ টাকা	২৯ টাকা ১২ আনা	২৬ টাকা ৫ আনা	৩১ টাকা

১৯৪৩ সালের অক্টোবরে চট্টগ্রামে চালের দাম বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮০ টাকায়। অথচ এ সময় বাংলার অধিকাংশ জেলায় চালের দাম ছিল ৪০ থেকে ৫০ টাকা মণ।[১০] উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শহরটির খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে চালের পরিবর্তে গম, বজরা আমদানি করা হয়। ফলে দুর্ভিক্ষকালীন চট্টগ্রাম শহরবাসীদের চালের পরিবর্তে বজরা খেতে হয়েছে। এ সম্পর্কে দুর্ভিক্ষকালীন চট্টগ্রাম শহরে অবস্থানরত বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল ফজল লিখেন,

চাউল শুধু দুর্মূল্য নয়, দুষ্প্রাপ্যও। ছেলে বুড়ো সবাইকে ভাগাভাগি করে খেতে হচ্ছে কিছু ভাত, কিছু ছোলা সিদ্ধ, কিছু বজরা। বজরা কি চিজ তা চোখে দেখা দূরে থাক আগে কোনোদিন নামও শুনিনি। দেখতে কালো ঘাসের বিচির মতো। এখন তাই আমাদের খাদ্য।[১১]

চরম এই খাদ্য সংকটের সময় শহরের অধিকাংশ মানুষ এই বজরাও খেতে পায়নি। অনেককেই শুধু এক বেলা খেয়ে দিনাতিপাত করতে হয়েছে।[১২] শুধু চট্টগ্রাম নয় বাংলা জুড়েই দুর্ভিক্ষের এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সরকার কলকাতাসহ অন্যান্য শহরে লঙ্গরখানা ও রেশন ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৪৩ সালের ২৯ মে চট্টগ্রাম শহরে বাংলার প্রথম লঙ্গরখানা খোলা হয়।[১৩] কলকাতা বাদ দিয়ে চট্টগ্রাম শহরে প্রথম লঙ্গরখানা খোলা শহটির ভয়ানক দুরাবস্থার কথাই প্রমাণ করে। দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ১১ জুনের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে শহটির বিভিন্ন স্থানে ১৫টি লঙ্গরখানা খোলা হয়। লঙ্গরখানাগুলোতে প্রতিদিন ১,৫০০ দরিদ্র ও নিরন্ন মানুষদের খাবার দেয়ার ব্যবস্থা ছিল।[১৪] তবে অনেকের ভাগ্যে এই খাবারও জুটতো না। কারণ বিপুলসংখ্যক নিরন্ন, বুভুক্ষু মানুষের জন্য লঙ্গরখানার এই খাবার ছিল অপ্রতুল যা চট্টগ্রামের কবিয়াল রমেশ শীল এর লেখায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে,

জাউ, খেচুরি পাইয়ম বুলি লঙ্গর খানাত যাই
হক্কলে পাইল রে খানা আঁর ভাগ্যত নাই। [১৫]

অন্যদিকে শহরটির দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সরকারের গৃহীত রেশন ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়। এই ব্যবস্থাটি ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল পণ্যদ্রব্যের স্বল্পতা ও বন্টন ব্যবস্থায় নৈরাজ্য। রেশন ব্যবস্থা চালু হলে সুযোগ সন্ধানীরা ভুয়া রেশন কার্ড বানিয়ে চাল, চিনি, কেরোসিন মজুদ শুরু করে। মজুদকৃত পণ্যসমূহ বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রি করে তারা লাখ টাকার মালিক হয়ে যায়।[১৬] এছাড়া রিলিফ, রেশন ও লঙ্গরখানা ব্যবস্থায় চরম অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি নৈরাজ্য ব্যাপকভাবে কালোবাজারিকে উসকে দেয়।[১৭] এই কালোবাজারি শহরবাসীর সংকটকে আরও ঘনীভূত করে। সাধারণ দরিদ্র শ্রেণিকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেয়। ফলে মে মাস থেকেই চট্টগ্রামের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। রাস্তায় রাস্তায় কঙ্কালসার মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। খাবারের অভাব এতটাই প্রকট আকার ধারণ করে যে, শহরের রাস্তাগুলোতে মৃতদেহ পাওয়া যেতে থাকে।[১৮] সরকারি তথ্যানুসারে, ১৯৪৩ সালের ২৮ জুন শহরের রাস্তায় দুর্ভিক্ষপীড়িত ১১ জনের মৃতদেহ পাওয়া যায়।[১৯] ছোট্ট একটি শহরের রাস্তায় একদিনে এতগুলো মানুষের মৃতদেহ পাওয়া শহরটির দ্রুত অবনতিশীল দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির প্রমাণ। এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে সরকার লঙ্গরখানায় আর খাদ্য সরবরাহ না করার সিদ্ধান্ত নেয়।[২০] এই সিদ্ধান্তে চট্টগ্রাম শহরের দুর্ভিক্ষাবস্থা জটিল আকার ধারণ করে। শহরটির দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষদর্শী বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ আবদুল করিম লিখেন,

... ডাস্টবিন থেকে ক্ষুধার্ত ছেলেবুড়ো মেয়ে মানুষকে খাবার তালাশ করে খেতে দেখেছি, ডাস্টবিন বা রাস্তার ধারে ক্ষুধায় মানুষের কাতরানি দেখেছি এবং মরা মানুষ দেখেছি।[২১]

আরেক প্রত্যক্ষদর্শী আবুল ফজলের বর্ণনায়,

"... পথে পথে দেখা যাচ্ছে হাড্ডিসার মানুষের সারি। ঘরের দরজা খোলার উপায় নেই, অভুক্ত মানুষের প্রেতমূর্তি দেখে আঁৎকে উঠতে হয়"।[২২]

শহরটির দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র এঁকেছেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী,

> ডাস্টবিনের চারিদিকে ক্ষুধাতুর মানুষ আর কুকুর খুঁজছে খাদ্য। বুড়ো ছেলে, নারী-পুরুষ সকলেই শ্মশানের প্রেতের মতো খাদ্য খুঁজছে। দলে দলে ছুটছে পথের ওপর দিয়ে লঙ্গরখানার উদ্দেশ্যে, অসংখ্য তারা। হাতে ভাঙা থালা, মাটির পাত্র, টিনের কৌটা। ঘুরছে দলে দলে নারী। তার শুকিয়ে যাওয়া স্তনে শিশুর জন্য দুধ নেই। ফুটপাতে আর জায়গা নেই। লঙ্গরখানা এদের জন্য স্বর্গ, ফ্যান (ভাতের মাড়) এদের কাছে অমৃত। এরা বাঁচতে চায়। নারীরা এতটুকু ফ্যানের জন্য উন্মুক্ত ফুটপাতে সতীত্ব বিসর্জন দিচ্ছে। স্ত্রী নয়, পুত্র নয়, পিতা নয়- কেউ আর আপনার নয়।[২৩]

এরূপ পরিস্থিতিতে অনাহারী মানুষ এমন অবস্থায় পৌছে যে, খাবার দোকানের সামনে অথবা খাবার গ্রহণকারীর পাশেই মৃত্যুবরণ করে। তারপরও কেউ কাউকে খাবার দিয়ে সাহায্য করে না। এমনকি ভাতের ফ্যান দিয়েও না। কারণ ফেলনা ফ্যানটিও এ সময় খুব দামি ছিল। মানবতার খাতিরেও কেউ কারো দিকে ফিরে তাকানোর সুযোগ ছিল না। তাইতো কবি রমেশ শীল লিখেন,

> দুই বেলা কেহ খায়না, কেহ কারো পানে চায় না।
> ভিক্ষা পায় না অন্ধ আতুর গনে।।[২৪]

দুর্ভিক্ষের সময় আলোচ্য শহরটিতে অবস্থান করছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী সোমনাথ হোর। দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষের নিদারুণ কষ্টের ছবি দেখে সোমনাথ হোর বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি পার্টির (কমিউনিস্ট পার্টি) কাছে তাঁকে চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নেয়ার আবেদন করেন। আবেদনে তিনি লিখেন,

> "আমি না খেয়ে মারা যেতে রাজি আছি। এই দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার মানুষের সামনে বসে আমি কি করে ভাত খাবো।"[২৫]

শহরটির দিনমজুর শ্রেণির নিদারুণ দুরবস্থার কথা জানা যায় আবদুল করিমের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে। খুব কাছ থেকে তিনি এই শ্রেণির ধুকে ধুকে নি:শেষিত হওয়া দেখেছেন। তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেন,

> ... দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে করাতীদের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। ফলে ... পরিবারের পরিণতি হল ভয়াবহ। এবং করুণ। ... ৮ থেকে ১০ জনের একটা গোটা পরিবারের সকলেই এক এক করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।[২৬]

শুধু দরিদ্র শ্রেণি নয় দুর্ভিক্ষ শহরটির মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভিতও নাড়িয়ে দেয়। চট্টগ্রাম কলেজের বাংলার শিক্ষক, বিশিষ্ট কবি আশুতোষ চৌধুরীর দুর্ভিক্ষকালীন সংকটে টিকে থাকার লড়াইয়ের কথা জানা যায় আবুল ফজলের লেখায়। আশুতোষ চৌধুরী চলমান মহামারীর সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিজের একমাত্র সম্বল বসত বাড়িটি বন্ধক রাখতে বাধ্য হন। তারপরও পরিবার নিয়ে দিনাতিপাত করা তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে তিনি একটি রেশনের দোকান দেন।[২৭] একজন কলেজ শিক্ষকের বই, খাতা, কলম রেখে হাতে দাঁড়িপাল্লা তুলে নেয়া, রেশনের দোকান দিয়ে সংসার চালানো দুর্ভিক্ষকালীন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির চরম দুরাবস্থার প্রমাণ। এ সময় শহরটির অনেক ছাত্রও বেঁচে থাকার জন্য লেখাপড়া ছেড়ে দিনমজুরি শুরু করে।

যেকোনো মহামারীতে নারীর অসহায়ত্ব অবর্ণনীয়। তাদের দুর্ভোগ-দুর্দশা বৃদ্ধি পায় সবচেয়ে বেশি। দুর্ভিক্ষকালীন চট্টগ্রাম শহরে অনাহারী নারীদের অসহায়ত্ব চরম আকার ধারণ করে। এহেন সংকটময় পরিস্থিতিতে নারীরা আর্থিক নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, নিরাপদ আশ্রয় সবই হারিয়ে নিদারুন অসহায় অবস্থায় পড়ে। এই অসহায়ত্ব মনুষ্যত্বের এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটায়। মনুষ্যত্বহীন সমাজের প্রধান শিকারে পরিণত হয় অনাহারী নারীরা। শহরের সৈনিক শিবিরে চাহিদানুসারে

দালালেরা অসহায় নারীদের সরবরাহ করতো। এছাড়া রাস্তা, সামরিক বিমান বন্দর তৈরির কাজ পাওয়ার জন্য কন্ট্রাক্টররা টাকা ঘুষ দেওয়ার পাশাপাশি নারী সাপ্লাই দিত। আর অনাহারী নারীরাও ছেলেমেয়েদের জীবন রক্ষার্থে, নিজের উদরপুর্তির জন্য অবলীলায় সতীত্ব বিকিয়ে দিতে বাধ্য হতো। কবিয়াল রমেশ শীলের কণ্ঠেও একই কথা ধ্বনিত হয়।[২৮]

দুর্ভিক্ষের আরেক আঘাত বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই চট্টগ্রাম, বর্ধমান, মেদিনীপুরে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, আমাশয় প্রভৃতি রোগ ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে।[২৯] চট্টগ্রামে কলেরা রোগের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা যায় কলকাতার সাপ্তাহিক পত্রিকা *বসুমতী* থেকে। পত্রিকাটির তথ্যমতে, ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে চট্টগ্রামের শহরে মৃতের সংখ্যা ছিল ৪ জন আর পূর্বের সপ্তাহে এই সংখ্যা ছিল ১৮ জন। গ্রামাঞ্চলে মৃতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮৭ ও ২২৩ জন।[৩০] অর্থাৎ চট্টগ্রামে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় কলেরা রোগের পরিস্থিতি শহরে ভালো ছিল। এছাড়া আলোচ্য কালপর্বে 'গোদ রোগ' নামে এক নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব হয় চট্টগ্রাম শহরে। কবিয়াল রমেশ শীলের লেখায়ও শহরটিতে বিভিন্ন রোগে মানুষের মৃত্যুর তথ্য পাওয়া যায়।[৩১]

উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যায়, ১৯৪৩ সালের প্রথম থেকেই চট্টগ্রাম শহরের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। ক্ষুধা আর বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবে মে-জুন মাস থেকে তা ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করে। অবশ্য মে এবং জুন মাসে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার অন্যান্য শহরগুলোর অবস্থাও প্রায় একই ছিল। এ দুই মাসে চট্টগ্রামসহ নোয়াখালি, রংপুর, ময়মনসিংহ, বাকেরগঞ্জ এবং ত্রিপুরায় মৃত্যু হার বেশি ছিল।[৩২] তবে চট্টগ্রাম শহরটির সর্বোচ্চ মৃত্যুহার ছিল জুলাই এবং আগষ্ট মাসে। মৃত্যু হারের এই উর্ধ্বগতি অব্যাহত ছিল ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।[৩৩] মুসলিম লীগের সাহায্য সমিতির সম্পাদক চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেনের বরাত দিয়ে *বসুমতী* তথ্য দেয়, "গত ৫ মাসে (আগষ্ট-ডিসেম্বর, ১৯৪৩) চট্টগ্রাম শহরের ৩০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৩ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে।"[৩৪] ১৯৪৪ সালের জুন মাস থেকে এই পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতে থাকে।[৩৫] সরকারি ও বেসরকারি তথ্য মতে, বাংলার অন্যান্য জেলার তুলনায় চট্টগ্রামে মৃতের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। Sir John Woodhead এর রিপোর্ট মোতাবেক, ১৯৪৩ সালে মৃত্যুর হার ছিল চট্টগ্রামে ১২১.০ শতাংশ, নোয়াখালী ৯৫.৬, ত্রিপুরা ১১৮.৬, ঢাকা ৮৬.৭ এবং ফরিদপুর ৫১.১।[৩৬] কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড যোশি এ সময় চট্টগ্রাম সফর করেন। তাঁর হিসেব মতে, ১৯৪৩ সালের অক্টোবরের আগেই চট্টগ্রামে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ।[৩৭] সুতরাং চট্টগ্রামের মৃত্যুহারের সরকারি ও বেসরকারি উভয় তথ্যই শহরটির দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করে।

নাগরিক সমাজ

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজের ভূমিকা আলোচনার পূর্বে নাগরিক সমাজ সম্পর্কে একটু ধারণা দেয়া প্রয়োজন। ইংরেজি Civil Society শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ সুশীল সমাজ বা নাগরিক সমাজ। সমাজের যে অংশ রাষ্ট্রের নানা অনিয়ম ও অসংগতি নিয়ে কথা বলে তাদেরকেই নাগরিক সমাজ বলা হয়। নাগরিক সমাজের সম্পর্কে Larry Diamond বলেন, Civil society is the realm of organized social life that is open, voluntary, bound by a legal order or set of shared rules.[৩৮]

Suchit Bunbongkarn এর মতে, Civil society may encompass a wide range of organizations concerned with public matters.[৩৯]

প্রকৃত পক্ষে নাগরিক সমাজ হলো বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনৈতিক দল, নিরপেক্ষ স্বাধীন বেসরকারি গ্রুপ, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষিত ব্যক্তি প্রমুখ যারা স্ব উদ্যোগে রাষ্ট্র, সমাজ ও জনগণের মঙ্গলার্থে ও কল্যাণের জন্য কাজ করে থাকে। এটি একটি সংগঠিত গোষ্ঠী। এর সদস্যরা নাগরিক অধিকার অর্জনের জন্য নানাবিধ উপায়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে। নাগরিক সমাজ জনগণের অধিকার সুরক্ষা ও এই বিষয়ে জনগণকে সচেতন করাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সমাজের এই অংশ অপেক্ষাকৃত অগ্রসর। এরা সরকার ও অর্থনৈতিক ব্যবসায়ী গ্রুপগুলো থেকে পৃথক একটি তৃতীয় স্রোতধারা।

উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে নাগরিক সমাজের বিকাশ ঘটলেও প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে এদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তবে সতেরো শতক থেকে আধুনিক পাশ্চাত্য সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে নাগরিক সমাজ শব্দ দুটি গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ নাগরিক সমাজের উপস্থিতি ও ভূমিকা সর্বকালেই ছিল এবং বর্তমানেও আছে। রাষ্ট্র ও সমাজভেদে এদের ধারণা ও ভূমিকা ভিন্ন। তবে নাগরিক সমাজ ধারণাটি অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রতিনিয়ত নব ব্যাখ্যার দ্বারা নবভাবে গঠিত হচ্ছে।[৪০]

চট্টগ্রাম শহরের দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় নাগরিক সমাজের ভূমিকা

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে চট্টগ্রাম শহরের ভয়াবহ সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে শহরটির নাগরিক সমাজ। এই দুর্ভিক্ষের শুরুতেই বাংলার চরম খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য ভারতের কামউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কলকাতা ও ঢাকায় খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে চট্টগ্রাম কমিউনিস্ট পার্টি[৪১] শহরে একই কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শহরটির জেলা প্রশাসকসহ সকল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম কংগ্রেস লীগ, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, হিন্দু মহাসভা, সমাজতন্ত্রী দল, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের উপস্থিতিতে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। শহরের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে উক্ত সভায় চট্টগ্রাম কংগ্রেস লীগের নেতা ব্যারিষ্টার এস, এল খাস্তগীর ও মুসলিম লীগের নেতা খান বাহাদুর আবদুস সাত্তার (যুগ্ম সভাপতি) ও সমাজতন্ত্রী দলের নেতা শ্রী মজুমদার ও মুসলিম লীগের সাহায্য সমিতির সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেনের দ্বারা একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি শহরের পাঁচটি পৌর এলাকার প্রত্যেকটিতে একটি করে 'ত্রাণ ভান্ডার' খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ত্রাণ ভান্ডার থেকে চাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। মাসিক ৩৫ টাকা (অনূর্ধ্ব) আয় বিশিষ্ট শহরের প্রত্যেক পরিবারকে রেশন কার্ডের মাধ্যমে চাল বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।[৪২]

দুর্ভিক্ষকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় চট্টগ্রামের কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কমিউনিস্ট পার্টি শহরের দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় পূর্ণেন্দু দস্তিদারের (১৯০৯-১৯৭১) নেতৃত্বে 'ডিফেন্স কমিটি' গঠন করে।[৪৩] এই কমিটির মাধ্যমেই কমিউনিস্ট পার্টি শহরে তাদের দুর্ভিক্ষকালীন বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই পার্টি দুর্ভিক্ষপীড়িত শিশুদের জন্য শহরের রহমতগঞ্জে একটি 'বেবি হোম' খোলে। হোমটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন ডা. এম এ হাশেম ও পুর্ণেন্দু দস্তিদার।[৪৪] বুভুক্ষ মানুষের

জন্য কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে শহরের তিনটি এলাকায় তিনটি লঙ্গর খানা খোলা হয়।[৪৫] অসহায় দুস্থদের চিকিৎসা সেবার জন্য এই পার্টির তত্ত্বাবধানে 'ত্রাণ হাসপাতাল' ও কালাজ্বর প্রতিরোধে ২৫০টি 'কালাজ্বর কেন্দ্র' খোলা হয়।[৪৬] হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অসহায় ও দুস্থদের আশ্রয় দেয়ার জন্য পৃথক 'অনাথ আশ্রম' খোলা হয়।[৪৭] এছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে 'ওয়ার্ক হাউস', 'মহিলাদের হস্ত শিল্প প্রকল্প' প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং কালোবাজারী ও মজুতদারী রোধে 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গঠন করা হয়।[৪৮] এ সময় চট্টগ্রাম জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি কল্পতরু সেনগুপ্তসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যেমন পূর্ণেন্দু দস্তিদার, কল্পনা দত্ত, ননী সেনগুপ্ত, রনধীর সেনগুপ্ত, বঙ্কিম সেন[৪৯] (১৯১১-১৯৭৩), অনঙ্গ সেন (১৯১৩-১৯৯৮) প্রমুখ দিনরাত ত্রাণ বিতরণ ও মানুষের সেবায় নিয়োজিত ছিল। শহরটির দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় কমিউনিস্ট পার্টির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে 'চট্টগ্রাম জেলা নারী সমিতি' ও 'জনরক্ষা ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। 'চট্টগ্রাম জেলা নারী সমিতি'র নেত্রী নেলী সেনগুপ্তা[৫০] 'বেবি হোম' এর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি শহরটিতে দুর্যোগকালীন বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি প্রায় প্রতিদিন বিকেলে লালদিঘীর পশ্চিম পাশে সমাবেশ করতো। সমাবেশে দুর্ভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণ করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য দেয়া হতো। সেই সাথে চোরাকারবারি ও মজুতদারদের বিরুদ্ধেও বক্তব্য দেয়া হতো। এছাড়া সমাবেশে বঙ্কিম সেন, হরিপদ কুশারী, রমেশ শীলের গান গাওয়া হতো।[৫১] তেজেন সেনের গাওয়া গণসংগীতগুলো যেন শহরবাসীদের ধ্বংসস্তুপ থেকে নতুনভাবে বেঁচে উঠার প্রেরণা যোগাতো। তবে তাদের এই কাজ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলতে পারেনি। ছাত্র নেতা কমরেড বিশ্বনাথ ও কমরেড পি. যোশীর চট্টগ্রামে অবস্থান ও তাদের গতিবিধি এবং কমিউনিস্ট পার্টির অন্যান্য কর্মীদের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারী কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।[৫২]

চট্টগ্রামের দুর্ভিক্ষ স্থানীয় শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের মনকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সদস্য ও শিল্পী কমরেড সোমনাথ হোর (১৯২১-২০০৬) ও চিত্ত প্রসাদকে (১৯১৫-৭৮) দুর্ভিক্ষকালীন ছবি আঁকতে শহরে ও গ্রামে-গঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় পাঠায়। দুর্ভিক্ষের সময় চট্টগ্রাম শহরে পাঁচ দিনব্যাপী 'ডিফেন্ড চিটাগাং' শিরেনামে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে চিত্তপ্রসাদ ও সোমনাথ হোরের দুর্ভিক্ষের ছবি ছাড়াও ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য স্টিভেনসন এবং ক্লাইভ ব্রেনসনের আঁকা ছবি ছিল।[৫৩] এছাড়া চিত্তপ্রসাদ এর দুর্ভিক্ষের উপর ৩টি কার্টুন কম্যুনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'জনযুদ্ধে' প্রকাশিত হয়। যা সচেতন মহলকে ভাবিত করে, তাদের চিত্তকে নাড়া দেয়। তিনটি কার্টুনের দুটি দুর্ভিক্ষের চরম সময়ে প্রকাশিত হয়। 'রেশন মালিকদের ফাঁকি ও চোরাকারবারি' বিষয়ক কার্টুনটি ১৯৪৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি আর এ বছরের ২৪ নভেম্বর প্রকাশিত হয় 'রুগ্ন কৃষক ও আড়তদার' বিষয়ক একটি কার্টুন। কার্টুন দুটির মাধ্যমে চিত্তপ্রসাদ রেশন মালিকদের দুর্নীতি-নৈরাজ্য, আমন ধানের চোরাকারবারি, আড়তদারদের দখলদারিত্ব প্রভৃতি বিষয়টি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলেন। ১৯৪৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত তাঁর তৃতীয় কার্টুনটিতে কাপড়ের অভাবে পত্রিকা দিয়ে ঢেকে দেয়া একটি মৃতদেহকে দেখানো হয়। কার্টুনটি দুর্ভিক্ষের সময়ের বস্ত্রের অভাবকে নির্দেশ করে। চিত্তপ্রসাদের এ সকল কার্টুন ভারতের শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী মহলকে সচকিত করেছিল। ছবিগুলো সম্পর্কে চিত্তপ্রসাদের সহযাত্রী শিল্পী সোমনাথ হোর এর মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য, "... তাঁর ছবিগুলো শিল্পীদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্কবাণী হিসেবে কাজ করেছিল"।[৫৪] চট্টগ্রামের দুর্ভিক্ষ নিয়ে

গান বেঁধেছেন চট্টগ্রামের বিশিষ্ট কবিয়াল রমেশ শীল (১৮৭৭- ১৯৬৭) এবং তাঁর শিষ্য ফণী বড়ুয়া (১৯১৫-২০০১) ও রাইগোপাল দাশ (১৯১৮-১৯৮৭)।[৫৫] তাদের গানে ফুটে উঠেছিল মন্বন্তরের মুখে উজাড় হওয়া চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চল ও শহরের বিধ্বস্ত জীবনযাত্রার ছবি।

দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সহায়তায় চট্টগ্রাম শহরের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বগণের ভূমিকাও ছিল প্রশংসনীয়। মাহবুব উল আলম চৌধুরী, সুচরিত চৌধুরী, বদিউল আলম, প্রভাত সেন, জামাল, জালাল, সত্য সাহা ও তাঁর বড় ভাই বিনয় সাহা, মহিউদ্দিন, ফনী ভূষন, রবি দত্ত প্রমুখ শহরের উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মুসলিম হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উক্ত অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে শিল্পী সুচরিত চৌধুরী বাঁশি বাজায়, নৃত্য শিল্পী প্রতিমা চৌধুরী ও বক্কু নৃত্য পরিবেশন করে এবং সংগীত শিল্পী ঊষা নন্দী ও প্রভাত কুমার সেন গান পরিবেশন করে। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক মাহবুব উল আলম চৌধুরীর[৫৬] (১৯২৭-২০০৭) রচিত 'ভাঙন' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। অনুষ্ঠানের টিকেট বিক্রিতে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাংকের ম্যানেজার প্রবোধ বর্মণ, কুমিল্লা ব্যাংকিং কর্পোরেশনের ম্যানেজার হরলাল চৌধুরী, অশোকা দাশ এবং ব্যবসায়ী আহমদ কবীর চৌধুরী। তারা অনুষ্ঠানের অধিকাংশ টিকেট ক্রয় করে নেয়। বিক্রিত টিকিটের সকল টাকা 'বেবি হোম'সহ বেশ কয়েকটি সাহায্য সংস্থাকে দেয়া হয়।[৫৭]

চলমান মহামারী মোকাবেলায় দলগত প্রচেষ্টার সাথে সাথে ব্যাক্তিগতভাবেও অনেকে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। কবি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ব্যবসায়ী মামা আহমদ কবীর চৌধুরী কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'বেবি হোমে' নিয়মিত অর্থ সাহায্য প্রদান করেন। এছাড়া তাঁর অর্থায়নে বেশ কয়েকটি লঙ্গরখানাও খোলা হয়।[৫৮] শহরটির একজন কর্নেল (কর্নেল দাশ) এর স্ত্রী অশোকা দাশ শহরের ত্রাণকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।[৫৯] দুর্ভিক্ষের সময় চট্টগ্রামের খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য চট্টগ্রাম কলেজের শিক্ষক আসহাব উদ্দিন আহমদ[৬০] (১৯১৪-২০০৬) কম খাওয়ার আন্দোলন শুরু করেন। তিনি মানুষকে ভাত কম খেয়ে পানি বেশি খাওয়ার কথা বলেন। এছাড়া তিনি প্রত্যেককে একটু একটু করে কম খেয়ে খাবার বাচানোর পরামর্শ দেন। উদ্ভূত সংকটময় পরিস্থিতিতে অল্প পরিমানে খাবার গ্রহণের উপর তিনি একটি প্রবন্ধও লিখেন। আসহাব উদ্দিন তাঁর বক্তব্য প্রচারের জন্য ছাত্রদের নিয়ে 'দেশ-প্রাণ' নামে একটি স্বেচ্ছসেবক বাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেন।[৬১] যদিও তাঁর এই উদ্যোগটি বেশি দিন চলে নি। তবে চরম খাদ্য সংকটের সময় সাময়িক সময়ের জন্য হলেও আসহাব উদ্দিনের উদ্যোগটি নি:সন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ ছিল। এভাবে চট্টগ্রাম শহরের দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কমিউনিস্ট পার্টিসহ শহরটির বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। এছাড়া শহরটির সংকটময় পরিস্থিতিতে ব্যক্তি পর্যায়েও সাধ্যমতো বিভিন্ন সাহায্য-সহযোগিতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, একদিকে চালসহ অন্যান্য খাদ্যশস্যের স্বল্পতা অন্যদিকে শহরে অনাহারী মানুষের দলে দলে নিত্য আগমন, পাইওনিয়ার কোরের সৈন্যশিবির স্থাপন প্রভৃতি শহরটির খাদ্য ভান্ডারে অধিক চাপ সৃষ্টি করে। উদ্ভূত সংকটময় পরিস্থিতিতে অপ্রতুল রিলিফ, রেশন, লঙ্গরখানা এবং এগুলোর অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি শহরটির দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। ফলে দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত বাংলার অন্যান্য শহরের তুলনায় চট্টগ্রামের মৃত্যু হার অনেক বেড়ে যায়।

দুর্ভিক্ষকালীন পরিবেশে শহরে কালোবাজারি, মজুতদারদের দৌরাত্ম্য, ডাস্টবিন থেকে কাক ও কুকুরের সাথে মানুষের খাবার ভাগাভাগির দৃশ্য, অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু প্রভৃতি ছিল স্বাভাবিক এক নৈমত্তিক চিত্র। শহরটিতে এ ধরনের ভয়ানক অবস্থা বিরাজমান ছিল ১৯৪৩ সালের প্রথম থেকে ১৯৪৪ সালের মে মাস পর্যন্ত। চরম এই সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা ছিল খুবই অপ্রতুল। তার উপর সরকার কর্তৃক পরিচালিত লঙ্গরখানাগুলো মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই বন্ধ করে দিলে শহরটির দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। তবে চট্টগ্রাম শহরের সংকটময় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে 'কমিউনিস্ট পার্টি', 'জনরক্ষা ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি', 'চট্টগ্রাম জেলা নারী সমিতি'সহ বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন। এছাড়া ব্যক্তি পর্যায়েও শহরটির সচেতন মহলের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। দুর্ভিক্ষের সময় শহরটির নাগরিক সমাজ 'ত্রাণ ভাণ্ডার', 'ত্রাণ হাসপাতাল', শিশুদের সুরক্ষায় 'বেবি হোম', হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক 'অনাথ আশ্রম', 'ওয়ার্ক হাউস', 'মহিলাদের হস্ত শিল্প প্রকল্প', কালোবাজারি ও মজুতদারি রোধে 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে নাগরিক সমাজ শহরজুড়ে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। আর এ সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, স্বেচ্ছাসেবা ও শ্রম দিয়ে সার্বক্ষনিক শহরের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে থাকে নাগরিক সমাজ। এছাড়া দুর্ভিক্ষের চিত্র প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিক্ষোভ সমাবেশ, সমাবেশে গণসংগীত পরিবেশন প্রভৃতির মাধ্যমে দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে শহরবাসীর মনোবল বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চট্টগ্রাম শহরের সচেতন নাগরিক সমাজের অক্লান্ত ও নিবেদিত শ্রম নি:সন্দেহে শহরটিকে আরও ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেছে। শহরটির সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় নাগরিক সমাজের এই ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়। দুর্ভিক্ষকালীন চট্টগ্রাম শহরজুড়ে নাগরিক সমাজের কর্মকাণ্ড সমাজের প্রতি এই গোষ্ঠীর প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্যের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Sir John Woodhead, *Famine Inquiry Commission: Report on Bengal* (Delhi: Government of India press, 1945), pp. 109-110

২. বাংলা সরকার গঠিত প্রথম দুর্ভিক্ষ কমিশন। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন স্যার জন উডহেড। সদস্য এস. ডি রামমূর্তি, মতিলাল নানাবতী, এম আফজাল হুসাইন ও ডব্লিউ. আর. ক্রয়েড

৩. *Census of India 1941,* Vol. IV, Bengal Tables (Delhi: Manager of Publications, 1942), p. 26

৪. আবদুল করিম, *সমাজ ও জীবন* ১ম খণ্ড (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ১০৯

৫. মুহাম্মদ নূরুল করিম, *স্মৃতিকথা* (ঢাকা: প্রকাশক আসমা খানম চৌধুরী, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯০), পৃ. ৫৪

৬. আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

৭. "গ্রাম থেকে ধীরে ধীরে অনাহারক্লীষ্ট লোকজন শহরের দিকে আসতে শুরু করে। নিরন্নের জোয়ার গ্রাম ছাপিয়ে এসে পড়ল শহরের চারিদিকে।" মাহবুব উল আলম চৌধুরী, *স্মৃতির সন্ধানে* (ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, এপ্রিল, ২০০৮), পৃ. ৮৮

৮. Sir John Woohead, *Op. cit,* p. 72

৯. *Ibid,* p. 40

১০. P.C Joshi, 'Chittagong: The Front Line District', *Peoples War,* 21 November 1943; *The Statesman,* 7 October, 1943; Sir Azizul Haq, *Evidence before Famine Enquiry Commission,* 1945, Vol. II, pp. 426-38

১১. আবুল ফজল, *রেখাচিত্র* (ঢাকা: গতিধারা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬), পৃ. ১৯৯

১২. Sir John Woodhead, *Op. cit,* p. 40

১৩. *Ibid,* pp. 41, 72

১৪. *Ibid,* p. 41

১৫. এস, এম, নূর-উল-আলম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি: জুন, ২০০৩), পৃ. ৩৪

১৬. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

১৭. J. Mukharjee, *Hungry Bengal: War, Famine and The End of Empire* (New York: Oxford University Press, 2015), p. 175.

১৮. মুহাম্মদ নূরুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

১৯. Sir John Woodhead, *Op. cit* , p. 41

২০. *Ibid,* p. 73

২১. আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

২২. আবুল ফজল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯

২৩. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

২৪. এস, এম, নূর-উল-আলম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

২৫. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

২৬. আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

২৭. আবুল ফজল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১

২৮. অন্নে-বস্ত্রে পেয়ে কষ্ট, কত সতীদের সতীত্ব নষ্ট, দারুণ এই উদরের কারণে।। এস, এম, নূর-উল-আলম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

২৯. Arup Maharatna, *The Demography of Indian Famines: A Historical Perspective,* (London: London School of Economics and Political Science, 1992), p. 268.

৩০. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বসুমতী', ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৩, ৪৮ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, পৃ. ৪

৩১. "মরে গিয়েও যারা আছে, তারাও মরতে বসেছে অনাহারে আর রোগের পীড়নে।" এস, এম, নূর-উল-আলম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫

৩২. Sir John Woodhead, *Op. cit,* p. 112

৩৩. *Ibid,* p. 227

৩৪. *বসুমতী*, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৩, ৪৮ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, পৃ. ৩

৩৫. Sir John Woodhead, *Op. cit,* p. 73

৩৬. *Ibid,* p. 114

৩৭. P. C. Joshi, Chittagong: The Front Line District, *Peoples Power,* 21 November, 1943; *The Statesman,* 23 November, 1943

৩৮. Larry Diamond, *Development of Democracy: Toward Consolidation,* (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1999), p. 218

৩৯. Suchit Bunbongkarn, *The Role of Civil Society in Democratic Consolidation in Asia,* https://dkiaspcss.edu, p. 138

৪০. Michael Edwards, *The Oxford Handbook of Civil Society*, (New York: Oxford University Press, 2011), p. 13

৪১. ১৯৩৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির চট্টগ্রাম শাখাটি গঠিত হয়। এর প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ননী সেনগুপ্ত। দুর্ভিক্ষকালীন চট্টগ্রাম কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কল্পতরু সেনগুপ্ত

৪২. প্রেমাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, '৪৩ এর বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি', *নন্দন পত্রিকা*, শারদ সংখ্যা (পশ্চিমবঙ্গঃ উত্তর দিনাজপুর, ১৯৯৬), পৃ. ৫০২, http://dspce.wbpublibnet.gov.india; *Peoples Power*, 21 November, 1943

৪৩. কমলেশ দাশগুপ্ত, *প্রাচীন হিন্দু সমাজ ও সেকালের হিন্দু সমাজ* (চট্টগ্রামঃ খড়িমাটি, অক্টোবর, ২০১৮), পৃ. ৫২৬

৪৪. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

৪৫. *তদেব*, পৃ. ৯০, ৯২

৪৬. কমলেশ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৬

৪৭. *The Statesman*, 23 November, 1943

৪৮. কমলেশ দাশগুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫২৬

৪৯. চট্টগ্রাম কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য বঙ্কিম সেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গ সংগঠন 'কৃষক সমিতি' ও 'সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের' অন্যতম উদ্যোক্তা

৫০. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেত্রী নেলী সেনগুপ্তা (১৮৮৬-১৯৭৩) চট্টগ্রামের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের স্ত্রী। ১৯১০ সালে স্বামীর সাথে নেলীও কলকাতায় কংগ্রেস রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি ১৯৪০ ও ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন

৫১. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

৫২. প্রেমাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০২

৫৩. কমলেশ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২২

৫৪. শুভেন্দু দাশগুপ্ত, *জনযুদ্ধে সোমনাথ হোর* (মুর্শিদাবাদঃ উত্তাস, সেপ্টেম্বর, ২০২১), পৃ. ৮

৫৫. '*হাজার বছরের চট্টগ্রাম*', *দৈনিক আজাদী*, ৩৫ বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা (চট্টগ্রামঃ নভেম্বর, ১৯৯৫) পৃ. ৩৬

৫৬. মাহবুব উল আলম চৌধুরী একাধারে কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং ভাষা সৈনিক। ১৯২৭ সালে চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র কংগ্রেসে যোগ দেন। একুশের প্রথম কবিতাটি তিনি রচনা করেন। ২০০৯ সালে মাহবুব উল আলম মরনোত্তর একুশে পদকে ভূষিত হন।

৫৭. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

৫৮. তদেব, পৃ. ৯০

৫৯. তদেব, পৃ. ৯২

৬০. অধ্যাপক আসহাব উদ্দিন আহমদ ১৯১৪ সালে চট্টগ্রামের বাঁশখালীর সাধনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আজীবন সংগ্রামী এই শিক্ষাবিদ ২০০৫ সালে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত হন

৬১. আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২- ১১৩

জমা প্রদানের তারিখ : ১৪.১১.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ১৩.০৮.২০২৩